স্কুল পোড়ানোর বিশ্বরেকর্ড এখন আমাদের!

নাশকতা | শেখ রোকন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের আগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় যেভাবে আমরা শতাধিক বিদ্যালয় পুড়িয়ে দিলাম, সেই 'রেকর্ড' আফগানিস্তানেরও আছে কি? সানডে টাইমসের একটি প্রতিবেদনে দেখেছিলাম, তালেবান জঙ্গিরা আফগানিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় দুই শতাধিক বিদ্যালয় জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এ জন্য তারা সময় নিয়েছিল দুই বছর, ২০০৭-০৮। এর আগে-পরে আফগানিস্তানে আরও স্কুল নিশ্চয়ই জ্বালানো হয়েছে, পশ্চিমা মিডিয়ায় এমন 'শকিঙ' খবর এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় শতাধিক বিদ্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়ার 'রেকর্ড' বোধহয় বাংলাদেশই প্রতিষ্ঠা করতে পারল

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেটের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র নরম্যান ট্রান্সক্রিপ্টের সিনিয়র রিপোর্টার জয় হ্যাম্পটন প্রশ্নটি তখনই তুলেছিলেন, যখন বহুল প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরুর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে ফেনীর দাগনভূঞার পাঁচটি স্কুলে আগুন দিয়ে বাংলাদেশে 'ওয়ার এগেইনস্ট এডুকেশন' শুরু হয়েছিল। ফেনী ও চট্টগ্রামের কয়েকটি স্কুলের আগুন-দগ্ধ ছবি দেখে ফেসবুকে রাজনীতি নিয়ে মনের ক্ষেদ থেকেই বলেছিলাম যে, মহাসড়ক-সড়কধারের গাছ হত্যার পর 'ওরা' এখন বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া শুরু করেছে। জয় ঠিক বুঝতে পারছিলেন না যে, নির্বাচনের সঙ্গে স্কুলে আগুন দেওয়ার সম্পর্ক কী। বলেছিলাম, এগুলোর 'অপরাধ' একটিই– অস্থায়ী পোলিং বুথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া। তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন, এতে করে শিশু শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা কী হবে! তারপর গত ৪৮ ঘণ্টায় অন্তত ১২০টি স্কুলে আগুন দিয়েছে 'দুর্বৃত্তরা'।

জয় যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাস করেন, সেখানে এভাবে স্কুলে আগুন দেওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না কেউ। তিনি ঢাকায় ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নিতে এসে রাজনীতির 'বিস্ময়কর' চেহারা দেখে ফেলেছেন। রাজনৈতিক সংঘাত বিবেচনায় স্বাগতিকরা নিরাপত্তা নিয়ে তাকে সতর্কও করেছে। কিন্তু স্কুলে যে এভাবে আগুন দেওয়াও রাজনীতির অংশ হতে পারে, সেই আভাস কেউ তাকে দেয়নি। একই কর্মসূচির আওতায় আমি নিজেও গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। জয়ের সংবাদপত্রে 'কর্মরত' ছিলাম মাসখানেক। আমার আগ্রহের বিষয় ছিল সেখানকার সংবাদপত্র কীভাবে পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদকীয় নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ওকলাহোমার পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু, রিপোর্টিং, নাগরিক সংগঠন প্রভৃতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা নিতে চেয়েছি। জয় হ্যাম্পটন এ সংক্রান্ত এসাইনমেন্টে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এর বাইরে সেখানকার একটি 'গ্রিন স্কুল' দেখতেও গিয়েছিলাম দু'জনে। এক কর্তা ব্যক্তি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেখাচ্ছিলেন, স্কুলের ডিজাইন কতটা পরিবেশ ও শিক্ষার্থীবান্ধব। কোনদিক দিয়ে কীভাবে আলো আসে, হাওয়া আসে; স্কুলের বাইরের অনভিপ্রেত আবহ যাতে শিক্ষার্থীদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব না ফেলে সেজন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া আছে। আমি কৌতুক করে বলেছিলাম– আমাদের দেশের স্কুলগুলো গরক্রেশেই 'গ্রিন'। অনেক স্কুলেই দরজা-জানালা-বেড়ার দুরবস্থার কারণে আলো-হাওয়া প্রবেশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। চারপাশ ও যাতায়াত ব্যবস্থাও যথেষ্ট 'প্রাকৃতিক'। সীমিত সাধ্যের মধ্যেও বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে আমরা কতটা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি, সেই কথাও অবশ্য তাদের জানিয়েছিলাম।

কেবল ওই স্কুলে নয়; আমেরিকান 'হার্টল্যান্ডের' এই জনপদের, যাদের অধিকাংশের কাছে বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে দেখা একটি নামমাত্র, যেখানেই গেছি বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য, সম্প্রীতির সমাজ ও শান্ত-সহিষ্ণু জনগোষ্ঠীর কথা তুলে ধরতে চেয়েছি। জানিয়েছে বাংলাদেশ যদিও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির ফাঁদে পড়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ২৩ বছর কাটিয়েছে; এই দেশের মাটি ও মানুষ পাকিস্তানিদের মতো নয়। এক রবীন্দ্রনাথই পাকিস্তানি ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে গৌরবজনক ভেদরেখা এঁকে দিয়েছেন। যদিও আফগানিস্তানের সঙ্গে আমরা একই দক্ষিণ এশিয়া বা সার্কের অংশ; সেখানকার গেরুয়া প্রকৃতির ধর্মীয় চরমপন্থা সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলায় এসে কীভাবে মিইয়ে যায়। এখানেও ধর্মীয় উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিতে চেয়েছে বটে, শান্তিপ্রিয় সমাজের চাপে কোণঠাসা হতে সময় লাগেনি। কিন্তু এখন জয় হ্যাম্পটন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন, আফগানিস্তানের মতো আমরাও কীভাবে বিদ্যালয়ে আগুন লাগাচ্ছি। প্রশ্নবিদ্ধ রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে জাতির মেরুদণ্ড বিবেচিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অবকাঠামো স্কুলই পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছি!

এখানেই শেষ নয়; দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের আগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় যেভাবে আমরা শতাধিক বিদ্যালয় পুড়িয়ে দিলাম, সেই 'রেকর্ড' আফগানিস্তানেরও আছে কি? সানডে টাইমসের একটি প্রতিবেদনে দেখেছিলাম, তালেবান জঙ্গিরা আফগানিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় দুই শতাধিক বিদ্যালয় জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এ জন্য তারা সময় নিয়েছিল দুই বছর, ২০০৭-০৮। এর আগে-পরে আফগানিস্তানে আরও স্কুল নিশ্চয়ই জ্বালানো হয়েছে, পশ্চিমা মিডিয়ায় এমন 'শকিঙ' খবর এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় শতাধিক বিদ্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়ার 'রেকর্ড' বোধহয় বাংলাদেশই প্রতিষ্ঠা করতে পারল। এমন আশঙ্কাও অমূলক নয় যে, যদি সরকার দ্রুততম সময়ে ভোটকেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত ১৮ হাজারের বেশি স্কুল-মাদ্রাসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কড়া প্রহরা না বসাত, তাহলে এই সংখ্যা গাণিতিক হারে বাড়তে পারত। এসব অঘটনের পরও যদি আমরা দাবি করি যে বাংলাদেশে চরমপন্থি তালেবানসুলভ প্রপঞ্চ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে?

নির্মম পরিহাস হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট এবং জনসাধারণের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিভাজন নিয়ে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন এতটাই মগ্ন যে, শিক্ষা অবকাঠামো ধ্বংসের এত বড় কাণ্ড হয়তো নজরেই পড়বে না। আফগানিস্তানে বিভিন্ন সময়ে স্কুল পোড়ানোর ঘটনা কিংবা মিসরের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় স্কুলে আগুন দেওয়া ও বোমা মারার ঘটনা কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নাড়িয়ে দিয়েছে, ওয়াকিবহালরা জানেন। এ বিষয়ে ১৯৯৮ সালেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন গ্রহণ করেছিল যে স্কুল ও হাসপাতালের মতো স্থাপনাকে বিবদমান সব পক্ষকে 'সেফ স্যাভেন' বিবেচনা করতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই এগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না। যারা এ ধরনের স্থাপনায় হামলা চালাবে, তাদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশে এতগুলো বিদ্যালয় যারা পুড়িয়ে ফেলল, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ওই রেজুলেশনবলে তাদের এখন আন্তর্জাতিক বিচারের সম্মুখীন করা যায় না? বিদ্যালয় পোড়ানোর বিষয়টি কিন্তু ফৌজদারি অপরাধের তুলনায়ও অনেক বেশি গুরুতর। এর বিরূপ প্রভাব বহুমাত্রিক হতে বাধ্য। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে স্কুল ভবন ও তার আসবাবপত্র কতটা কষ্ট ও অপেক্ষার পর বরাদ্দ বা সংগৃহীত হয় কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। আমরা দেখতে পাই, ঝড়ে ভেঙে পড়া কিংবা নদীভাঙনের কবলে পড়া স্কুল ভবন পুনর্নির্মাণে বছরের পর বছর লেগে যায়। রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে কিংবা গাছের তলায় শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। হয়তো ভবন আছে; কিন্তু চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ না থাকায় মেঝেতে পরিচালনার খবর ও চিত্রও এই একুশ শতকের বাংলাদেশে এসেও সংবাদপত্র থেকে বিদায় নেয়নি। ভোটের আগুনে পুড়ে যাওয়া এসব স্কুল শিক্ষা অবকাঠামোর বিবর্ণ চিত্র আরও ধূসরই করে তুলবে, সন্দেহ নেই।

যে দেশে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা এখনও সুলভ নয়, সেখানে রাজনৈতিক কারণে এভাবে স্কুল পোড়ানো উচিত হয়েছে কি-না, যুযুধান 'নির্বাচনবিরোধী' গোষ্ঠীর কাছে সেই প্রশ্ন তোলা অবান্তর। যারা জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারে, নির্বিচারে গাছের গোড়ায় করাত চালাতে পারে, তাদের কাছে শিক্ষার মূল্য ও সম্ভাবনা নিয়ে সুবিবেচনা আশা করা মূঢ়তা। কিন্তু সরকার কি এগুলো রক্ষা করতে পারত না। প্রধান বিরোধীদলীয় জোট যেখানে আগে থেকেই নির্বাচন ঠেকানোর ঘোষণা দিয়েছিল, বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী কার্যক্রমে সহিংস বাধা প্রদান করছিল; সেখানে ভোটকেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত স্কুল, মাদ্রাসা বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো নিরাপত্তাহীন রাখা কোনোভাবেই উচিত হয়নি। দেখা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতির পর কোনো বিদ্যালয় কাম পোলিং বুথে নাশকতার ঘটনা ঘটেনি।

যাই হোক, এখন সরকারের উচিত হচ্ছে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পুড়ে যাওয়া ভবনগুলো সংস্কার এবং আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা। বিদ্যালয় ভবনে পুড়ে যাওয়া বই ও নথিপত্র আর পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরগুলোর কর্তব্য হচ্ছে, প্রয়োজনীয় নথির অভাবে যাতে বিদ্যালয়টির শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে আন্তরিক নজর রাখা। প্রাণপ্রিয় বিদ্যালয় পুড়তে দেখে মানসিক হোঁচট খাওয়া শিশু শিক্ষার্থীদের নিরাময়ের দায়িত্ব নিতে হবে সমাজের সবাইকে। যারা রাজনৈতিক উন্মত্ততায় বিদ্যালয় পোড়ানোর সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, তারাও সংস্কার প্রক্রিয়া ও স্বাভাবিককরণ কাজে যুক্ত হয়ে পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন বৈকি! তবে যারা প্রত্যক্ষভাবে এই সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী অপকর্মে যুক্ত, তাদের বিচার করতেই হবে। রাজনৈতিক কারণে এভাবে যে জাতীয় ও সামাজিক সম্পদে আগুন দেওয়া যায় না, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া সেই বোধ তারা অর্জন করতে পারবেন বলে মনে হয় না। যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর সম্পৃক্ততা বিভিন্ন সময়েই কামনা করে এসেছেন, তাদের উচিত হচ্ছে বিদ্যালয় পোড়ানোর হোতাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনটি কাজে লাগানোর চেষ্টা চালানো।

○ শেখ রোকন : সাংবাদিক ও গবেষক
skrokon@gmail.com

সমকাল
তারিখ 06 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬